বাজারে নকল প্রযুক্তিপণ্য

শীর্ষে হার্ডডিস্ক পেনড্রাইভ র‍্যাম পাওয়ার ব্যাংক

হিটলার এ. হালিম

বাজারে নকল প্রযুক্তি পণ্যের ছড়াছড়ি। একটু অসতর্ক হলেই বগলদাবা করে আপনিই হয়তো নকল পণ্য নিয়ে ঘরে ঢুকবেন। সুতরাং সাবধান! প্রযুক্তিপণ্য কেনার আগে একটু যাচাই করে তবেই কিনবেন। তবে এ বিষয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। কারণ, এসব নকল পণ্য বন্ধের কারও কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। না সরকার, না প্রযুক্তিপণ্যের ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলোর। অভিযোগ রয়েছে, সর্ষের মধ্যেই ভূত রয়েছে। যারা এগুলো বন্ধের উদ্যোগ নেবে, তারাই এসবের সাথে যুক্ত। ফলে সাবধান হতে গিয়েও হয়তো ভাববেন তাহলে করবটা কী। এমন অবস্থায় প্রযুক্তিপণ্যের ক্রেতাসাধারণকে সতর্ক করতেই এ প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের অবতারণা।

নতুন মোড়কে পুরনো হার্ডডিস্ক

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বন্ধ ৪-৬ বছর, অথচ দেশের প্রযুক্তি বাজারে মিলছে বন্ধ হয়ে যাওয়া ওইসব প্রতিষ্ঠানের নতুন নতুন হার্ডডিস্ক! এসব হার্ডডিস্ক দেশে দেদার বিক্রি হচ্ছে। বিশেষ করে মফস্বলে এসব হার্ডডিস্কের চাহিদা ও বিক্রি বেশি। অথচ এসব দেখার বা নিয়ন্ত্রণ করার কেউ নেই।

বর্তমানে ডেস্কটপ কমপিউটারের (পিসি) হার্ডডিস্ক উৎপাদন করছে সিগেট, তোশিবা আর ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল (ডব্লিউডি)। দেশের বাজারে এই তিন ব্র্যান্ডের হার্ডডিস্ক পাওয়ার কথা থাকলেও পাওয়া যাচ্ছে হিটাচি, ফুজিৎসু, স্যামসাং, ম্যাক্সটরসহ অনেক কোম্পানির হার্ডডিস্ক। এসব কোম্পানির কোনোটি চার বছর, কোনোটি পাঁচ বছর আবার কোনোটি ছয় বছর আগে ডেস্কটপ পিসির হার্ডডিস্কের উৎপাদন বন্ধ ঘোষণা করেছে।

ডেস্কটপ পিসির জন্য হার্ডডিস্কের মেয়াদ দুই বছরের। ধরে নেই হিটাচি, ফুজিৎসু, স্যামসাং, ম্যাক্সটরের যেসব হার্ডডিস্ক বাজারে পাওয়া যাচ্ছে, দুই বছর আগে সেসব হার্ডডিস্কের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তাহলে ২০১৩ বা ২০১৪ সালের পর এসব হার্ডডিস্ক বাজারে পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। পাওয়া গেলেও তাতে মেয়াদ থাকার কথা নয়। অথচ এসব হার্ডডিস্ক ওয়ারেন্টি ছাড়াই বিক্রি হচ্ছে বাজারে। যেসব হার্ডডিস্ক পাওয়া যাচ্ছে, তার তিনভাগের একভাগ বা ক্ষেত্রবিশেষে অর্ধেক দামে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এর সাথে একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী জড়িত। এরা পুরনো হার্ডডিস্ক চীন, তাইওয়ান ও হংকং থেকে নতুন করে মোড়কজাত করে এনে বাজারে বিক্রি করছে। আর এসবই হচ্ছে আন-অথরাইজড চ্যানেলে। এতে করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ক্রেতারা। তারা পুরনো হার্ডডিস্ক নতুন মনে করে কিনে প্রতারিত হচ্ছেন। কোনো ধরনের ওয়ারেন্টি ছাড়া হার্ডডিস্ক কিনে সমস্যাগ্রস্ত হলেও কারও কাছে প্রতিকার চাইতে পারছেন না। সম্প্রতি ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডের কমপিউটার মার্কেট থেকে এ ধরনের হার্ডডিস্ক কিনে কয়েকজন সমস্যায় পড়েছেন বলে জানা গেছে। ওদিকে দেশে হার্ডডিস্কের অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটরেরা অসাধু ব্যবসায়ীদের এই কুকর্ম ঠেকানোর জন্য বিভিন্নমুখী উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

হার্ডডিস্ক নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সিগেট ১৯৮৯ সালে সিডিসি, ১৯৯৬ সালে কোনার, ২০০৬ সালে ম্যাক্সটর (ম্যাক্সটর ২০০০ সালে কোয়ান্টাম ও ১৯৯০ সালে মিনি স্ক্রাইবকে কিনে নেয়) এবং ২০১১ সালে স্যামসাংয়ের হার্ডডিস্ক উৎপাদনকারী ইউনিটকে কিনে নেয়। অন্যদিকে ডব্লিউডি ১৯৮৮ সালে ট্যান্ডনকে অধিগ্রহণ করে। আইবিএমকে ২০০২ সালে হিটাচি ও হিটাচির একটি অংশকে (২.৫ ইঞ্চি) ২০১১ সালে ডব্লিউডি এবং ৩.৫ ইঞ্চির ইউনিটকে ২০১২ সালে তোশিবা কিনে নেয়। এই তোশিবা আবার ২০০৯ সালে কিনে নেয় ফুজিৎসুর হার্ডডিস্ক নির্মাণকারী ইউনিটকে। ফলে এখন হার্ডডিস্ক (ডেস্কটপ) নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে রয়েছে সিগেট, তোশিবা ও ডব্লিউডি। এই তিনটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যসব প্রতিষ্ঠানের হার্ডডিস্ক উৎপাদনকারী ইউনিটের অস্তিত্বও নেই, অথচ বাজারে এসব কোম্পানির হার্ডডিস্ক মিলছে।

স্মার্ট টেকনোলজিস বিডি লিমিটেডের (সিগেট ও তোশিবা হার্ডডিস্কের অনুমোদিত পরিবেশক) মহাব্যবস্থাপক (বিক্রয় ও বিপণন) মুজাহিদ আলবেরুনী সুজন বলেন, একটি হার্ডডিস্ক বিক্রি করলে কত টাকা মুনাফা থাকে– ৫০-১০০ টাকা। আর যেসব হার্ডডিস্ক নতুনরূপে বাজারে আসছে, সেসব বিক্রি করে খুচরা ব্যবসায়ীরা কয়েকগুণ মুনাফা করছে। সুতরাং অরিজিনালটি আমাদের কাছ থেকে নেবে কেন। মুজাহিদ আলবেরুনী সুজন জানান, ঢাকার ক্রেতারা অনেক সচেতন। ফলে ঢাকায় এটা খুব বেশি না চললেও মফস্বলের লোকজন কম টাকায় এসব হার্ডডিস্ক মুড়ি-মুড়কির মতো কিনছে। তাদের কাছে পণ্যের মানের চেয়ে দামটাই আসল। তিনি বলেন, মফস্বলের ডিলাররা আমাদের পণ্য বিক্রির চেয়ে হারিয়ে যাওয়া কোম্পানির হার্ডডিস্ক বিক্রি করতে বেশি আগ্রহী।

মুজাহিদ আলবেরুনী সুজন আরও বলেন, যেসব হার্ডডিস্ক (হিটাচি, ফুজিৎসু, স্যামসাং, ম্যাক্সটরসহ অনেক) আমরা মেরামত বা রিপ্লেসমেন্টের জন্য উৎপাদকদের কাছে পাঠাই দেখা যায় সেসবের বিপরীতে আমাদের ক্রেডিট নোট দেয়া হয় বা অন্য কোনোভাবে পাওনা সমন্বয় করা হয়। আর ওইসব পণ্য 'ফ্যাক্টরি রি-সার্টিফায়েড' করে নতুন মোড়কে অন্যরা দেশের বাজারে আনছে, যা দিন দিন ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করছে।

পুরনো হার্ডডিস্ক নতুন মোড়কে বিক্রির মূলে রয়েছে বিশাল অঙ্কের মুনাফার হাতছানি। এ অঙ্ক কয়েকগুণ হওয়ায় এর হাতছানি উপেক্ষা করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয় বলে মনে করেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান কমপিউটার সোর্সের (ডব্লিউডি হার্ডডিস্কের অনুমোদিত পরিবেশক) হেড অব স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট মেহেদী জামান তানিম। তিনি বলেন, এভাবে হার্ডডিস্ক বিক্রি সারাদেশে মাকড়সার জালের মতো বিস্তার লাভ ▸

পেনড্রাইভ নকল হচ্ছে

নকল হার্ডড্রাইভের মতো নকল পেনড্রাইভেও দেশের প্রযুক্তি বাজার সয়লাব। ঢাকায় আসল-নকল মেশানো থাকলেও মফস্বল শহরগুলোতে দেদার বিক্রি হচ্ছে এসব নকল পণ্য। যার কারণে বাজার ও সুনাম হারাচ্ছে প্রকৃত পেনড্রাইভের ব্র্যান্ডগুলো। আমদানিকারক ও অনুমোদিত পরিবেশকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে এসব অভিযোগ।

পোর্টেবল ইউএসবি মেমরি ডিভাইস হিসেবে খ্যাত পেনড্রাইভ নকল হচ্ছে এবং এই নকল পেনড্রাইভ ব্যবহার করে ক্ষতির শিকার হচ্ছেন ব্যবহারকারীরা। নকলটিতে অল্প ডাটা সেভ করতেই দেখাচ্ছে 'স্পেস' নেই। কখনও পেনড্রাইভ ওপেন হচ্ছে না, ডাটা হারিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি নানা সমস্যা। এদিকে ব্যবহারকারীরা ভাবছেন, এই কোম্পানির পেনড্রাইভ ভালো নয়। অথচ সংশ্লিষ্ট কোম্পানিটি হয়তো পেনড্রাইভের ক্ষেত্রে কোনো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। দেশের একাধিক অনুমোদিত পেনড্রাইভের পরিবেশকের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তারাও এ ধরনের অভিযোগ পাচ্ছেন। অভিযোগ যাচাই করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট পেনড্রাইভটি তাদের প্রতিষ্ঠানের নামের হলেও সেটি নকল। ভালো করে বুঝিয়ে বলার পর বিষয়টি ক্রেতারা খেয়াল করতে পারছেন। পেনড্রাইভগুলো কিনে কয়েক দিন ব্যবহারের পরই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একবার এসব পণ্য নষ্ট হয়ে গেলে আর ঠিক করা যায় না। এসব কারণে প্রতিনিয়ত পণ্য কিনে ঠকছেন ক্রেতারা। অনেক সময় সস্তায় অনেক বেশি ডাটা ধারণক্ষমতার (গিগাবাইট) পেনড্রাইভ কিনলে প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

সারোয়ার মাহমুদ খান
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী ইউসিসি

দেশের পেনড্রাইভ বাজারের শতকরা ৪০-৪৫ ভাগ শেয়ার রয়েছে ট্রান্সসেন্ড ব্র্যান্ডের। ট্রান্সসেন্ড পেনড্রাইভও নকল হচ্ছে এবং তা বিক্রি হচ্ছে রাজধানীসহ সারাদেশে। ট্রান্সসেন্ড ব্র্যান্ডের পেনড্রাইভের অনুমোদিত পরিবেশক ইউসিসি (কমপিউটার সোর্সও ট্রান্সসেন্ড বিক্রি করে)। ইউসিসির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী সারোয়ার মাহমুদ খান জানান, ঢাকার ক্রেতারা অনেক সচেতন। তাই অসাধু ব্যবসায়ীরা টার্গেট করছে মফস্বলকে। ওখানকার ক্রেতারা প্রযুক্তিপণ্য কেনার সময় রাজধানীর ক্রেতাদের মতো খুঁটিয়ে দেখে না। রাজাধানীর ক্রেতাদের গুলিস্তানের পাতাল মার্কেট, হাতিরপুলের মোতালেব প্লাজা, মতিঝিল ও পল্টন এলাকা থেকে পেনড্রাইভ কেনার সময় সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন, একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী চীন থেকে নকল পেনড্রাইভ বানিয়ে আনছে। এসব মার্কেটে নকল পেনড্রাইভ বিক্রির পাশাপাশি ব্যবসায়ীরা তা পাঠিয়ে দিচ্ছেন ঢাকার বাইরেও।

সারোয়ার মাহমুদ খান জানান, প্রযুক্তিপ্রেমীদের ট্রান্সসেন্ডের প্রতি শতভাগ আস্থা থাকায় এই পেনড্রাইভটি বেশি নকল হচ্ছে। প্যাকেট একই রকম, লোগোও এক। এগুলো ক্রেতারা ধরতে পারেন না। গত ৪-৫ বছর ধরে পেনড্রাইভের বাজারে এ ধরনের নকলের উৎসব চলছে। নকল পেনড্রাইভে বিক্রেতারা ওয়ারেন্টিও দিচ্ছে না। দিলেও তিন মাস বা ছয় মাস। ক্রেতারাও অল্প টাকার জিনিস বলে ওয়ারেন্টি 'ক্লেইম' করতে যান না।

সারোয়ার মাহমুদ খান জানালেন, দেখা গেল বাজার থেকে কেনা একটি পেনড্রাইভের ধারণক্ষমতা ১৬ গিগাবাইট। কমপিউটারে ঢোকালে ১৬ গিগাবাইটই দেখাচ্ছে, কিন্তু ৪ গিগাবাইটের বেশি ডাটা রাখতে গেলেই পেনড্রাইভ 'মেমরি ফুল' দেখাচ্ছে। এগুলোই নকল। পেনড্রাইভটি ফরম্যাট দিলে ওই ৪ গিগাবাইটই দেখাবে। আসল পেনড্রাইভ কিনতে পেনড্রাইভের পেছনে বা প্যাকেটে সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের হলোগ্রাম স্টিকার (নিরাপত্তা স্টিকার) দেখে কেনার পরামর্শ দেন তিনি।

দেশে কিংস্টোন ও স্যানডিস্ক নামে দুটি ব্র্যান্ডের পেনড্রাইভ পাওয়া যায়। কিন্তু এ দুটো পণ্যের কোনো অনুমোদিত পরিবেশক দেশে নেই। এ সুযোগটাও নিচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। কিংস্টোন ও স্যানডিস্ক নামে দুটি পণ্য দেশের বাজারে রিফার্বিশ হয়ে ঢোকায় আসল পণ্যগুলো বাজার হারাচ্ছে। মোবাইল মার্কেট দিয়ে এসব নকল পণ্য বাজারে ঢুকছে। যারা বিক্রি করছেন তারা নিজেরাই ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন। তাদের কম দামে পণ্য কেনা থাকায় গ্রাহকেরা কখনও কোনো সমস্যা নিয়ে এলে তা পাল্টে দিচ্ছেন। ফলে ক্রেতা প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারেন না বিষয়গুলো।

করছে। এর শুরু রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডের মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারের কমপিউটার মার্কেট থেকে। এর শেকড় এখন অনেক গভীরে চলে গেছে। তিনি জানান, মাল্টিপ্ল্যান সেন্টার থেকে তা সারাদেশের বাজারে ছড়িয়ে পড়ছে। এমনকি আইডিবি ভবনের বিসিএস কমপিউটার মার্কেটেও এসব হার্ডডিস্ক বিক্রি হচ্ছে।

মেহেদী জামান তানিম আরও জানান, কোরিয়া, চীন ও সিঙ্গাপুর থেকে আসা যাত্রীদের লাগেজে বা হ্যান্ডক্যারির মাধ্যমে এসব হার্ডডিস্ক দেশে ঢুকছে। তিনি বলেন, বন্ধ হয়ে যাওয়া কোম্পানিগুলোর এসব হার্ডডিস্ক (কোনোটার ওয়ারেন্টি থাকে ৩ বা ৬ মাস বা এক বছর) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আরএমইতে গেলে প্রাইসিং (নতুন করে দাম নির্ধারণ) করা হয়। একেকটা হার্ডডিস্কের নতুন দাম ধরা হয় ১০-১২ ডলার। এরপর রি-সার্টিফায়েড বা রিফার্বিশ করে বাজারে ছাড়া হয়। আর আমাদের দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী কিনে এনে দেশের বাজারে প্রায় অরিজিনাল হার্ডডিস্কের দামে বিক্রি করছে।

তিনি উদারহণ দিয়ে বলেন, ধরা যাক ডব্লি-উডি ব্র্যান্ডের ১ টেরাবাইটের হার্ডডিস্কের দাম ৪ হাজার ৩০০ টাকা। অন্য ব্র্যান্ডের রি-সার্টিফায়েড বা রিফার্বিশ করা ১ টেরাবাইটের হার্ডডিস্ক ব্যবসায়ীরা ডিলারদের কাছে বিক্রি করছেন ৩ হাজার ৯০০ টাকায়। ডিলারেরা তা খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে ১০০-১৫০ টাকা বেশি দামে বিক্রি করেন। ফলে খুচরা ব্যবসায়ীদের একটি হার্ডডিস্কে ২৫০-৩০০ টাকা পর্যন্ত লাভ থাকে, যা অরিজিনাল হার্ডডিস্ক বিক্রি করলেও লাভ থাকে না। তাহলে ব্যবসায়ীরা কেন অরিজিনাল হার্ডডিস্ক বিক্রি করবেন। প্রশ্ন করেন তিনি।

ডিলারেরা একটি হার্ডডিস্ক ৮০০-১০০০ টাকায় কিনে দেশে বিক্রি করছেন ৩ হাজার ৯০০ থেকে ৪ হাজার টাকায়। এই বিশাল মুনাফার হাতছানিতে পড়ে তারা অরিজিনাল হার্ডডিস্ক বিক্রিতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন। নিজেরা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার মুখ দেখলেও ক্রেতারা হচ্ছেন প্রতারিত। তিনি বলেন, এসব হার্ডডিস্ক কিনলে অনেক সময় ১ টেরাবাইটের জায়গায় ৫০০ গিগাবাইট, ৫০০ গিগাবাইটের হার্ডডিস্কে দেখায় ১ টেরাবাইট। ব্যবহারের সময় কিন্তু ৫০০ গিগাবাইটও পুরোপুরি কাজ করে না। ক্রেতার পক্ষে এসব বোঝা খুবই শক্ত।

বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির (বিসিএস) মহাসচিব নজরুল ইসলাম মিলন জানান, এ ধরনের কথা তারাও শুনেছেন। তারা সোর্স চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন। এজন্য তারা কাস্টমসের সাথে বসে বিষয়টির সুরাহা করতে উদ্যোগী হবেন বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, একেবারে সাপ্লাইয়ের জায়গাটি যদি বন্ধ করে দেয়া যায়, তাহলে এ ধরনের পণ্যগুলো আর বাজারে আসবে না। উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেলেও তা একেবারে বাজার থেকে শেষ হয়ে যায় না। নানাভাবে বিশেষ করে গ্রে মার্কেট দিয়ে এটি মূল বাজারে প্রবেশ করে।

হার্ডডিস্ক কেনার আগে ক্রেতাদের পরামর্শ

বাজার থেকে হার্ডডিস্ক কেনার সময় খেয়াল রাখতে হবে পণ্যটিতে ওয়ারেন্টি রয়েছে কি না। ওয়ারেন্টি না থাকলে তা কেনা সমীচীন হবে না। চ্যানেলবিহীন পণ্য কিনবেন না। এই তিন প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে হার্ডডিস্ক কিনলে তা নিশ্চিতভাবেই বন্ধ হয়ে যাওয়া কোম্পানিগুলোর। এসব হার্ডডিস্ক কিনলে কিছুদিনের মধ্যেই সমস্যা দেখা দেবে, ব্যাডসেক্টর পড়বে। ডাটা গায়েব হয়ে যাওয়াসহ যেকোনো সময় তা ক্র্যাশও করতে পারে। ফলে হার্ডডিস্ক কিনতে সাবধান। ▶

বাজারে স্যামসাংয়ের নকল মেমরি কার্ড

হার্ডডিস্কের পাশাপাশি প্রযুক্তি বাজারে ছড়িয়ে পড়ছে নকল মেমরি কার্ড। স্যামসাং এসডি ও মাইক্রো এসডি ছাড়া কোনো মেমরি কার্ড উৎপাদন না করলেও এর নাম ব্যবহার করে দেশে বিক্রি হচ্ছে মেমরি কার্ড। মেমরি কার্ড ভর্তি স্যামসাংয়েরর লোগোযুক্ত প্যাকেট দেখে বোঝার উপায় নেই যে এগুলো স্যামসাংয়ের নয়, নকল মেমরি কার্ড। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, স্যামসাং যে এসডি ও মাইক্রো এসডি কার্ড তৈরি করে তা বাংলাদেশের বাজারে পাওয়ার কথা নয়। স্যামসাং থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। স্যামসাংয়ের নাম ভাঙিয়ে নকল এসব কার্ড এক ধরনের অসাধু ব্যবসায়ীরা তৈরি করে বাজারজাত করছে। নিম্নমানের এসব কার্ড দামেও সস্তা। হলো তা শতেক ঘটনাকে প্রতিনিধিত্ব করে। সাধারণ মানুষ এসব ঘটনা শুনলে বলবেন ইলেকট্রনিকের জিনিস, এমনটা ঘটতেই পারে। প্রযুক্তিবিদ এবং প্রেমীরা শুনলেই বলবেন এগুলো নকল পাওয়ার ব্যাংক।

স্মার্টফোন ও ট্যাবের চার্জ দ্রুত শেষ হয়ে যায় বলে চলন্ত অবস্থায় বা বাসার বাইরে চার্জের নিশ্চয়তা দেয় এই পাওয়ার ব্যাংক। দেশের বাজারে কয়েকটি ব্র্যান্ডের উন্নতমানের পাওয়ার ব্যাংক রয়েছে। এগুলো গুণে ও মানে সেরা হলেও বাজারে দেদার মিলছে মানহীন, নকল ও বেনামি ব্র্যান্ডের পাওয়ার ব্যাংক। দাম কম হওয়ায় স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা এসব সস্তা পাওয়ার ব্যাংকের প্রতি ঝুঁকছেন। আর নিজের অজান্তেই ডেকে নিয়ে আসছেন নিজের সর্বনাশ তথা স্মার্টফোনের সর্বনাশ।

> আমাদের দুর্ভাগ্য এই, আমাদের আইন আছে, সবকিছু আছে, কিন্তু কোনো প্রয়োগ নেই। বলা হচ্ছে ধরা হবে, কিন্তু ধরা হচ্ছে না। আসলে এখানে সততার কোনো দাম নেই। খারাপের দাপটই বেশি।
>
> পুরনো প্রযুক্তিপণ্য দেশে আসছে। এতে করে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। ব্যবহারকারীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।
>
> বলা হচ্ছে ডিউটি ফ্রি বা জিরো ডিউটির কথা। এতে করে হাতে হাতে পণ্য ঢুকছে দেশে। যদিও মিনিমাম একটা ডিউটি (হতে পারে তা ৫ শতাংশ) ধরা হয়, তাহলে হাতে হাতে বা লাগেজে করে পণ্য ঢোকা বন্ধ হবে। সবাই আমদানি করবে। সরকার রাজস্ব পাবে বেশি পরিমাণে।
>
> ডিজিটাল ক্যামেরাকে তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য হিসেবে ধরা হচ্ছে না। এর জন্য আলাদা কোড করা হয়েছে। এর ওপর ডিউটি ৫৭ শতাংশের বেশি। অন্যদিকে মোবাইল ফোন আমদানিতে কম ডিউটি (শুল্ক) ধরা হচ্ছে, কিন্তু মোবাইলে হাইরেজ্যুলেশনের ক্যামেরা থাকলেও তা ডিজিটাল ক্যামেরা ক্যাটাগরিতে পড়ছে না। এই বৈষম্য দূর না হলে হাতে হাতে পণ্য ঢোকা বন্ধ করা যাবে না।
>
> আমাদের দেশে বিদেশ থেকে নতুন প্রযুক্তিপণ্যের নামে ই-বর্জ্যও আসছে। যদিও এসব দেশে আসার কথা নয়। এগুলো বন্ধ করতে হবে।
>
> আমি দেখেছি, অন্যান্য দেশে ততটা হয় না। আমাদের দেশে অসংখ্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম হয়। আমাদের দেশে কাজের চেয়ে কথা বেশি। কাজ করতে হবে।

আবদুল্লাহ এইচ কাফি
সাবেক সভাপতি
বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি

স্যামসাং বাংলাদেশের মোবাইল ফোন বিভাগের প্রধান হাসান মেহেদী বলেন, স্যামসাং কোনো মেমরি কার্ড তৈরি করে না। কারা এবং কীভাবে এটি বিক্রি করছে তা আমাদের জানা নেই।

নকল পাওয়ার ব্যাংকে বাজার সয়লাব

আপনার স্মার্টফোনের চার্জ প্রায় শেষ। চার্জ দেবেন বলে পাওয়ার ব্যাংকের সাথে সংযুক্ত করলেন। কিন্তু একি! মোবাইল নয়, চার্জ হচ্ছে পাওয়ার ব্যাংক। স্মার্টফোনটিতে যে চার্জ ছিল সেটুকুও নিমিষেই শেষ! বাজার থেকে সদ্য কেনা পাওয়ার ব্যাংকে চার্জ বেশিক্ষণ থাকছে না। মোবাইলে কিছুক্ষণ চার্জ দিতেই চার্জ শেষ। ব্যাপার কী? আগেই জানা থাকায় ব্যাটারি খুলতে গিয়ে দেখলেন একটি বাদে সব ব্যাটারি বালিভর্তি।

এ ধরনের ঘটনা খুঁজলে আরও পাওয়া যাবে। কিন্তু এখানে যে ঘটনা দুটির কথা উল্লেখ করা

বর্তমানে অ্যাপাসার, ডিলাক্স, এডেটা, টিম ও হুয়াওয়ে এই পাঁচটি ব্র্যান্ডের পাওয়ার ব্যাংক অনুমোদিত পরিবেশকের মাধ্যমে দেশের বাজারে আসছে। এর বাইরেও নামকরা কিছু ব্র্যান্ডের পাওয়ার ব্যাংক আসছে 'গ্রে মাধ্যমে' (হ্যান্ডক্যারি বা লাগেজে করে)। এছাড়া আর যেসব পাওয়ার ব্যাংক বাজারে পাওয়া যাচ্ছে তা খুব নিম্নমানের। সম্প্রতি রাজধানীর কারওয়ান বাজার, ফার্মগেট ও শাহবাগ সিগন্যালে হকারদের নামবিহীন (১০০-১৫০ টাকায়) পাওয়ার ব্যাংক বিক্রি করতে দেখা গেছে। পাওয়ার ব্যাংক কিনলে ক্রেতাকে উপহার হিসেবে একটি কার্ড রিডার দেয়া হয়। আলাদা করে প্রতিটি কার্ড রিডার ৩০ টাকায় বিক্রি করতে দেখা গেছে। নামি ব্র্যান্ডের একটি পাওয়ার ব্যাংক যেখানে ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার ৫০০ টাকায় বিক্রি হয়, সেখানে ১০০-১৫০ টাকা বা ৩০০-৫০০ টাকার মধ্যে কী মানের পাওয়ার ব্যাংক পাওয়া যায়, তা সহজে অনুমেয়।

দেশে যেভাবে স্মার্টফোন ব্যবহারকারী বাড়ছে, তাতে করে আগামী দিনে এর (পাওয়ার ব্যাংক) চাহিদা আরও বাড়বে। আর এই সুযোগটাই নিচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীরা বলে মন্তব্য করেছেন টিম ব্র্যান্ডের অনুমোদিত পরিবেশক ইউসিসির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী সারোয়ার মাহমুদ খান। তিনি বলেন, আমরা যে পণ্য আনি তা আনতে কত ধরনের সার্টিফিকেট (নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট) দিতে হয় তার ঠিক নেই। ওইসব কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত সার্টিফিকেট না দিলে পণ্যের 'এয়ার শিপমেন্ট' হয় না। তার বদ্ধমূল ধারণা, এসব নকল পাওয়ার ব্যাংক

> এর জন্য সরকারের কোনো উদ্যোগ নেই, নিয়ন্ত্রণ তো আরও দূরের কথা। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল পুরনো কমপিউটার আমদানিতে। এখন নতুন কমপিউটারের নামে পুরনোগুলো দেদার আমদানি চলছে। দেখার কেউ নেই।
>
> দেশের কয়েকটি মার্কেটে এরকম পুরনো কমপিউটার, ল্যাপটপ আমদানি করে নতুন নামে বিক্রি করছে। তবে কোথাও কোথাও (ঠেকে গেলে) পুরনো হিসেবেই বিক্রি হচ্ছে।
>
> বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি (বিসিএস) এসব বন্ধে উদ্যোগ নিতে পারে। কিন্তু সর্ষেও ভেতরে যে ভূত আছে। এ কারেণে বিসিএস পারে না বা পারছে না।
>
> এসব পুরনো পণ্য (হার্ডডিস্ক, র‍্যাম, পাওয়ার ব্যাংক, মনিটর, পেনড্রাইভ) নতুন পণ্যের বাজার নষ্ট করছে। নষ্ট করছে প্রযুক্তিপ্রেমীদের বিশ্বাস। ফলে অরিজিনাল পণ্যের বাজার নষ্ট হচ্ছে। ছোট হচ্ছে।

মোস্তাফা জব্বার
বিশিষ্ট তথ্যপ্রযুক্তিবিদ

নকল র‍্যাম

কমপিউটারের জন্য র‍্যাম কিনতে চান? হুট করেই কিনে ফেলবেন না। বাজারে কমপিউটারের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় আসল র‍্যামের পাশাপাশি রয়েছে নকল র‍্যামের ছড়াছড়ি। নাম এক, লোগো এক, এমনকি র‍্যামের প্যাকেটে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির নিরাপত্তা সিলও (ট্যাগ) রয়েছে। ফলে বোঝা বেশ শক্ত কোনটি আসল, কোনটি নকল র‍্যাম।

নকল র‍্যামের দাম আসল র‍্যামের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় ক্রেতারা না বুঝে, না চিনে নকলের প্রতি ঝুঁকছে। 'নতুন র‍্যাম' লাগানোর পর কমপিউটার আগের মতো পারফর্ম করছে না, গতি ধীর হয়ে যায়, কখনও হ্যাং করছে, কাজের মাঝে হঠাৎ রিস্টার্ট হয়ে যায়। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এসবই হচ্ছে কমপিউটারে নকল র‍্যাম লাগানোর ফলে।

সম্প্রতি বাজারে নকল ও কপি র‍্যামের সরবরাহ ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে। যদিও এমন অভিযোগ আগে থেকেই ছিল। অতিসম্প্রতি তা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। দেশের প্রযুক্তি বাজারে র‍্যামের পরিবেশকেরা (আমদানিকারকেরা) বলছেন, তারা মেমরি মডিউলের ব্যবসায় থেকে সরে যেতে চাইছেন। কারণ হিসেবে বলছেন, আগে তারা মাসে ১৫ হাজার বিক্রি করলেও এখন এক হাজার র‍্যাম বিক্রি করতেও হিমশিম খাচ্ছেন। এছাড়া আসল র‍্যামের সাথে নকল র‍্যামের দামের পার্থক্য ২০০-৩০০ টাকা হওয়ায় তারা নিজেরাও কোনো ধরনের মার্জিন রাখতে পারছেন না। অন্যদিকে ক্রেতাদেরও বোঝাতে ব্যর্থ হচ্ছেন আসল র‍্যামের সুফল। প্রযুক্তিপণ্যের ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা, শুধু নকল র‍্যামের কারণে শিগগিরই শত শত কমপিউটার অচল হয়ে যেতে পারে।

আবদুল ফাত্তাহ
চেয়ারম্যান
গ্লোবাল ব্র্যান্ড (প্রা:) লি:

দেশের প্রযুক্তি বাজারে ট্রান্সসেন্ড, অ্যাপাসার, এডেটা, টুইনমস, টিইএম ব্র্যান্ডের র‍্যাম রয়েছে এবং এগুলোর অনুমোদিত পরিবেশকও রয়েছে। ডাইনেট, টি-র‍্যাম নামে স্বল্প পরিচিত ব্র্যান্ডের র‍্যামও রয়েছে বাজারে। এর পাশাপাশি ননব্র্যান্ডের কিছু র‍্যাম বাজারে পাওয়া যায়। নামি-দামি ব্র্যান্ডের র‍্যামই কপি বা নকল হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, দেশের একশ্রেণির প্রযুক্তি ব্যবসায়ী চীন ও হংকং থেকে ননব্র্যান্ডের র‍্যাম কিনে দেশের বাজারে ছাড়ছে। আরও অভিযোগ রয়েছে, চীন ও হংকংয়ের বাজারে নামহীন বিভিন্ন ধরনের র‍্যাম পাওয়া যায়। চাইলে ওই নাম-পরিচয়হীন ব্র্যান্ডের র‍্যামের উৎপাদকেরা ক্রেতার দেয়া নাম বসিয়ে (প্রিন্ট) দিচ্ছে র‍্যামের গায়ে। এমনকি নামি ব্র্যান্ডের র‍্যামের আমদানিকারকদের নিরাপত্তাসূচক ট্যাগও তৈরি করে মোড়কের গায়ে বসিয়ে দিচ্ছে। ফলে কোনোভাবেই আসল-নকল চেনার উপায় থাকছে না।

গ্লোবাল ব্র্যান্ডের (এডেটা ব্র্যান্ডের পরিবেশক) চেয়ারম্যান আবদুল ফাত্তাহ বলেন, আমরা মেমরি মডিউলের ব্যবসায় ছেড়ে দিচ্ছি। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আগে আমরা প্রতিমাসে ১২-১৫ হাজার র‍্যাম বিক্রি করতাম, এখন তা এক হাজারে নেমে এসেছে। এভাবে তো টিকে থাকা যাবে না। তিনি জানান, শুল্ক ফাঁকি দিয়ে দেশে প্রচুর পরিমাণে পণ্য (র‍্যাম, প্রসেসর) ঢুকছে কেজি হিসেবে। আর তারা পণ্য আমদানি করেন প্রতি পিস হিসেবে। এভাবে চললে তো বৈধ পথের আমদানিকারকেরা টিকে থাকতে পারবেন না। আর এ কারণে সরকার প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব হারাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আবদুল ফাত্তাহ জানান, বিমানবন্দর ও চট্টগ্রাম বন্দরে 'নন-চ্যানেলের' মাধ্যমে দেশে প্রচুর পরিমাণে এসব পণ্য ঢোকায় সঠিকভাবে শুল্কায়ন হচ্ছে না। এসব সমস্যার কথা সম্প্রতি তিনি সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে জানিয়েছেন। তার মতে, এ সবের প্রতিকার না হলে দিন দিন এসব পথে দেশে দেদার পণ্য ঢুকবে। তিনি জানান, তাদের আমদানি করা র‍্যামও (এডেটা) কপি হচ্ছে। কোনোভাবেই তা রোধ করতে পারছেন না তারা।

ট্রান্সসেন্ড ব্র্যান্ডের র‍্যামের পরিবেশক ইউসিসির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী সারোয়ার মাহমুদ খান জানান, ট্রান্সসেন্ড চীন থেকে কপি করে এনে দেশের বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এতে অরিজিনাল র‍্যাম বাজার হারাচ্ছে। তিনি বলেন, এই কিছুদিন আমরা যে র‍্যামের কোটেশন করলাম ২ হাজার ৮০০ টাকা, অন্য একটি প্রতিষ্ঠান তা কোট করল মাত্র ১ হাজার ৬০০ টাকায়। তিনি প্রশ্ন করেন, এটা কপি বা নকল না হলে কীভাবে সম্ভব? তিনি জানান, ইউসিসি আগে মাসে ১৫ হাজার র‍্যাম বিক্রি করলেও এখন হচ্ছে এক হাজারের কিছু বেশি।

অরিজিনাল র‍্যামের সাথে নকল র‍্যামের বা কপি র‍্যামের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, এতে লো কোয়ালিটি বা ডাউন গ্রেডের চিপ ব্যবহার করা হয়। এর পিসিবি বোর্ডটাও থাকে নকল। সারোয়ার মাহমুদ খান বলেন, চীনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদক) র‍্যাম তৈরি করে। তাদের কাছে যেকোনো নামের র‍্যাম দিতে বললে, র‍্যামের ওপর ওই নাম প্রিন্ট করিয়ে দিচ্ছে। এসব র‍্যাম নিম্নমানের। এরচেয়েও নিম্নমানের র‍্যাম হলো যেগুলোয় নকল চিপ ও পিসিবি বোর্ড দিয়ে তৈরি করা হয়। এসব পণ্যই বাজার দখল করে নিচ্ছে।

জানা গেছে, দেশে এখন পকেটে পকেটে র‍্যাম ঢুকছে। এগুলো অরিজিনাল হলেও সরকার শুল্ক হারাচ্ছে। ক্রেতারা পাচ্ছেন না ওয়ারেন্টি। বিমানবন্দর দিয়ে কপি ও নকল র‍্যাম ঢুকছে বাক্স ভরে। এই কিছু দিন আগেও আমদানিকারকেরা মাসে ১৫ হাজার পিস র‍্যাম বিক্রি করলেও এখন এক হাজার পিস বিক্রি করতে তাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে।

টুইনমস র‍্যামও নকল হচ্ছে। অনেক প্রতিষ্ঠান চীন থেকে নকল র‍্যাম নিয়ে আসছে। এতে ক্রেতারা অরিজিনাল টুইনমস র‍্যাব কিনতে পারছেন না। এসব কারবারির আস্তানা এলিফ্যান্ট রোডের বাজারগুলোতে। এসব কারবারিদের এখনই ঠেকাতে না পারলে এক সময় বাজারে অরিজিনাল র‍্যামও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সংশ্লিষ্টরা পরামর্শ দেন– কেনার আগে সংশ্লিষ্ট র‍্যামের অনুমোদিত পরিবেশক আছে কি না, তার খোঁজ করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা সিলসহ তা কেনার জন্য। তাহলে ঠকার শঙ্কা কম থাকবে। সংশ্লিষ্টরা বললেন, বাজারে নতুন আসা কোনো র‍্যাম নকল বা কপি হয় না। কোনো একটি ব্র্যান্ড জনপ্রিয়তা পেলে, বাজার শেয়ার দখলে নিলে, সেই র‍্যামের দিকে চোখ পড়ে 'দুষ্টচক্রের'। আশঙ্কা বেড়ে যায় তখনই। ফলে দেখা যাচ্ছে, ব্র্যান্ড যত জনপ্রিয় সেই ব্র্যান্ডের নকল বা কপি হওয়ার ঝুঁকি তত বেশি।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এলিফ্যান্ট রোডকেন্দ্রিক প্রযুক্তি বাজারগুলো এসব অপকর্মের আখড়া বলে বিবেচিত হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। এখানে এসব পণ্য আসছে, পরে সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ছে সারাদেশের প্রযুক্তি বাজার ও দোকানগুলোয়। সবাই সব জানে, কিন্তু কেউ কিছু বলছে না। যারা এসব করছে তারাও কমপিউটার ব্যবসায়ী। কমপিউটার ব্যবসায়ীদের সংগঠন বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতিও তাদের ব্যাপারে নমনীয় মনোভাব পোষণ করছে। অনেকে অভিযোগ করেছেন, সমিতি যদি এসব ব্যবসায়ীকে চিহ্নিত করতে যায় তাহলে 'ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়' হয়ে যাবে। সমিতির নেতাদের কাছে জানতে চাইলে তাদের গৎবাঁধা উত্তর– আমরাও শুনেছি। কিছু কিছু হচ্ছে। তবে এত বেশি নয়। তাদের ধরার বিষয়ে আমরা তৎপর রয়েছি। ভবিষ্যতে ঠিক হয়ে যাবে।

সমুদ্রপথে ঢুকছে। আকাশপথে এসে থাকলেও তা অন্য কোনো কিছুর ঘোষণা দিয়ে আনা হচ্ছে। তিনি জানান, নকল পাওয়ার ব্যাংকে অ্যামপিয়ার ঠিক থাকে না, কম দামি এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারিও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এসবে নিকেল ও সিসা ফ্রি থাকে না। ফলে এসবে পরিবেশগত ঝুঁকির পাশাপাশি স্বাস্থ্যঝুঁকিরও ভয় থাকে।

দেশের একশ্রেণীর প্রযুক্তিপণ্যের ব্যবসায়ী চীন থেকে সস্তায় পাওয়ার ব্যাংক কিনে এনে দেশের বাজারে বিক্রি করছে। গুণগত মান, নিরাপত্তা কিছুই দেখা হচ্ছে না। দেশে এনে সেসবের একেকটিতে নাম বসিয়ে বাজারে ছাড়া হচ্ছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, এসব অপকর্ম হচ্ছে রাজধানীর হাতিরপুলের মোতালিব প্লাজার চতুর্থ ও পঞ্চম তলায়। চীন থেকে কম দামে নামহীন পাওয়ার ব্যাংক নিয়ে এসে সেসবের গায়ে বসিয়ে দেয়া হচ্ছে স্যামসাং, সনি ও প্যানাসনিক লোগো। খোঁজ করে জানা গেছে, এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের কোনোটিই পাওয়ার ব্যাংক তৈরি করে না। অথচ এগুলো বাজারে ছাড়ায় ক্রেতারা ভাবছেন এটা বুঝি বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডের পাওয়ার ব্যাংক। আসলে এসব মোতালিব প্লাজায় নির্মিত। এই মার্কেটের পাশাপাশি এলিফ্যান্ট রোডের কমপিউটার মার্কেটগুলো থেকে রাজধানীসহ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলতে চাইলে কেউই কথা বলতে রাজি হননি। তবে একজন নাম-পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এসব পণ্যে লাভ বেশি। তাই সবাই এগুলো বিক্রি করছেন। দাম কম হওয়ায় ক্রেতাকে গছিয়ে দেয়াও সহজ। তার দাবি, যেসব ক্রেতা এই পণ্যগুলো কেনেন তারা জেনে-বুঝেই কেনেন। তিনি প্রশ্ন করেন, তারা কি আর জানেন না ৩০০ টাকা আর ২৫০০ টাকার পণ্যের মধ্যে কী পার্থক্য?

নকল পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহারে ক্ষতি

বাজারে অরিজিনাল (আসল) পাওয়ার ব্যাংকের চেয়ে নকল পাওয়ার ব্যাংক বেশি। ফলে নকল পণ্যের মার্কেট শেয়ার বেশি। নকল পাওয়ার ব্যাংকে মোবাইল ফোন নষ্ট হবে, কখনও চার্জিং ইউনিট (মাদারবোর্ড) নষ্ট হবে, ব্যাটারিও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কখনও কখনও পাওয়ার ব্যাংক চার্জ নেবে না। ফুল চার্জ দেখাবে কিন্তু মোবাইলে দিতে গেলে দেখাবে ১০-১৫ শতাংশ চার্জ। তিনি বলেন, এমনও হতে পারে যে দেখা গেল হঠাৎ অতিরিক্ত ভোল্ট চলে এলো কিন্তু পাওয়ার ব্যাংক চার্জ নিচ্ছে না।

চীনের একশ্রেণীর প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদক রয়েছে, যারা একসাথে লাখ লাখ পিস পাওয়ার ব্যাংক তৈরি করে। তাদের কাছে ফরমায়েশ পাঠালে এবং কোনো নাম নির্ধারণ করে দিলে তারা সে মতে পণ্য তৈরি করে পাঠায়। এমনকি ওইসব উৎপাদক বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের কাছে পণ্যের ফরমায়েশ ই-মেইলে পাঠিয়ে থাকে। তাতে বিভিন্ন ধরনের দাম ও শর্তের কথা উল্লেখ থাকে।

এরকমই একটি মেইলের খোঁজ পাওয়া গেছে। তাতে দেখা গেছে, 'সিবিডি-১১' নামে ওই পাওয়ার ব্যাংকের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে এগুলো স্ট্যান্ডার্ড পণ্য। কাস্টোমাইজ বা লোগো বসিয়ে নিতে হলে অতিরিক্ত চার্জ দিতে হবে। যদি ১ হাজার পিস পাওয়ার ব্যাংকের অর্ডার করা হয় তাহলে ওই প্রতিষ্ঠানটি (শিবোডা টেকনোলজি কোম্পানি লিমিটেড) ফরমায়েশ পাঠানো প্রতিষ্ঠানের লোগো বিনা খরচে বসিয়ে দেবে। যে মূল্য তালিকা দেয়া ছিল তা ট্যাক্স ছাড়া, তবে প্যাকিং খরচ প্রতিষ্ঠানটি বহন করবে বলে উল্লেখ করা হয়। অগ্রিম মূল্যপ্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানটি তিন দিন পর পণ্য ডেলিভারি দেবে তাও উল্লেখ করা হয়েছে ওই মেইলে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, চীনের অনেক নির্মাতা প্রতিষ্ঠান একসাথে লাখ লাখ পিস পাওয়ার ব্যাংক তৈরি করে। এ দেশের অনেক ব্যবসায়ী চীনে গিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে এসব মানহীন পাওয়ার ব্যাংক 'যেকোনো একটি' নাম বসিয়ে নিয়ে আসেন। অনেক সময় পাওয়ার ব্যাংক নির্মাতা যে নাম দেয়, সেই নামের পাওয়ার ব্যাংক নিয়ে আসেন ব্যবসায়ীরা। এ কারণে দেখা যায় বাজারে অদ্ভুত অদ্ভুত নামের পাওয়ার ব্যাংক।

এসব বিক্রি হয়ে গেলে আবারও তা আনা হয়। দেখা যায়, ওই নির্মাতার উৎপাদিত পাওয়ার ব্যাংক শেষ হয়ে গেছে। আবার নতুন পাওয়ার ব্যাংক তৈরি করেছে। ব্যবসায়ীরা নতুন পাওয়ার ব্যাংকগুলোই কিনে আনেন। ফলে একই নামের পাওয়ার ব্যাংক বাজারে খুব বেশিদিন দেখা যায় না। অনেকে নামবিহীন পাওয়ার ব্যাংক দেশে এনে বিভিন্ন নাম দিয়ে বাজারে ছাড়ছেন। অনেকে আবার চীন থেকেই 'একটি লোগো হিসেবে বসিয়ে আনেন।

বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, এসব পাওয়ার ব্যাংকের বড় সমস্যা হলো 'অ্যামপিয়ার' ঠিক না থাকা। বেশিরভাগ সময় দেখা যায় পাওয়ার ব্যাংকের গায়ে হয়তো লেখা ২০ হাজার অ্যামপিয়ার, কিন্তু চার্জ দিয়ে ব্যবহারের সময় দেখা যায় মাত্র ৪ হাজার বা ৪ হাজার ৫০০ অ্যামপিয়ার। অ্যামপিয়ার বেশি দেখানো হলেও দাম রাখা হয় আসল পাওয়ার ব্যাংকের চেয়ে অনেক কম। ফলে ক্রেতারা বিক্রেতাদের পাতানো ফাঁদে পড়েন।

আসল পাওয়ার ব্যাংক চেনার উপায়

এগুলোতে পলিমার ব্যাটারি ব্যবহার করা হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে এগুলো পাতলা হয়। অন্যদিকে নকল পাওয়ার ব্যাংকে মোটা লিথিয়াম ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়, অনেক সময় মোটা ব্যাটারিগুলো চাপ দিয়ে চ্যাপ্টা করে টেপ পেঁচিয়ে ব্যবহার করা হয় কজ

আসছে নকল মোবাইল ফোন

আইফোন নকল হচ্ছে। এ খবর পুরনো। নতুন খবর হলো, নকল আইফোন এখন আমাদের দেশেও পাওয়া যাচ্ছে। চীনের তৈরি নকল আইফোন খুব কম দামে মিলছে এই শহর ঢাকায়। ৫-১০ হাজারের মধ্যে পাওয়া যাবে নকল আইফোন। একটু সতর্ক থাকলে নকল আইফোন চেনা সম্ভব। নকল আইফোন থেকে আইক্লাউডে অ্যাকাউন্ট খোলা যায় না। এছাড়া স্যামসাং, এইচটিসিসহ আরও নামি-দামি ব্র্যান্ডের নকল ফোন পাওয়া যাচ্ছে।

এছাড়া অবৈধভাবে দেশে ঢোকা ফোনও পাওয়া যাচ্ছে। এগুলো আসছে হাতে হাতে, লাগেজে করে। এসব ফোনে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসির কোনো অনুমোদন নেই। এসব অনুমোদনহীন ফোন না কিনতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো অনুরোধ জানিয়েছে সবার প্রতি।

গত ২৮ আগস্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থা রাজধানীর বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্সের মোবাইল শপগুলোতে অভিযান চালিয়ে এক হাজার অনুমোদনহীন মোবাইল ফোন জব্দ করে, যার বেশিরভাগই এইচটিসি ব্র্যান্ডের। এর মূল্যমান প্রায় ২ কোটি টাকা